ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 33- 38
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.266

দার্শনিক মননে রবীন্দ্রনাট্য: এক প্রতিবাদী চেতনা

ড. মহ. মহিদুর রহমান, *সহকারী অধ্যাপক, চাঁচল কলেজ, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabindranath Tagore's philosophical outlook extends from incompleteness to completeness, from limitation to the radiant light of the infinite, and is permeated by a universal consciousness. With profound philosophical reflection, he articulated his own philosophical awareness in a distinctively oppositional and resistant tone. Among the various methods traditionally discussed in philosophical discourse, the dialectical method is particularly noteworthy. In dialectics, both reconciliation and opposition are acknowledged; thus, the search for a more comprehensive truth within opposing viewpoints constitutes the essence of the dialectical method. Rabindranath employed this dialectical approach in most of his plays.

In the central or principal characters of the majority of his dramas, Rabindranath expressed his own resistant consciousness in the light of a deep life-ideal. At the same time, he also shaped the other characters within the framework of specific philosophical perspectives. Through characters such as Dhananjaya or Abhijit in Muktadhara, Nandini in Raktakarabi, Panchak in Achalayatan, Jaysingha in Bisarjan, Amal in Dak Ghar, and the King in Raja, Rabindranath made his own philosophy vividly manifest.

The continuous, spontaneous, and ceaselessly dynamic movement of human life itself constitutes Muktadhara. Human beings are constantly carried along by the current of motion. Through various conditions across successive births, they move forward incessantly. This movement, this dynamism, is the true nature of life, and within this very motion lies the fulfillment of human existence. In philosophy, materialism refers to an emphasis on bodily pleasure or pleasurable sensations. The background of Rabindranath's play Raktakarabi (1926) is rooted in materialism. In this drama, Rabindranath creates a favorable atmosphere for thesis, antithesis, and ultimately synthesis.

Keywords: Dialectical method, philosophical reflection, ultimate reality, mechanization, materialism, Muktadhara, Raktakarabi

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মূলত দার্শনিক। তবে প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য সৃষ্টির উদ্ভাসনে তিনি হয়ে ওঠেন কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সার্থক ছোটোগল্পের শিল্প স্রষ্টা ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। জীবনের বহুমাত্রিক শাখা-প্রশাখা ও শেকড়ের সন্ধান তাঁর লেখনি সত্তায় এনে দিয়েছে সুগভীর জীবন দৃষ্টি, দার্শনিক মনন। এই মনন নিয়েই রবীন্দ্রনাথ জীবনকে পূর্ণাঙ্গ ও সত্যান্বেষী রূপে বিমূর্ত করে তোলেন। প্রতিভাসিত করেন জীবনের তাৎপর্যকে। তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল চেতনা অভিনব মাত্রায় প্রদর্শিত।

জীবনের চরম সত্যবোধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দ্যেশ্য নিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিবাদী চেতনা ব্যক্ত করেছেন। জীবনের মূল্যবোধ, মানবিকতা, শুভ ও মঙ্গলবাণী, সুস্থ সুন্দর ও পবিত্র জীবনের সাধনা করেছেন। সেই সাধনার বাণীতেই ফুটে উঠেছে প্রতিবাদী চেতনার অভিনব সুর।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি অপূর্ণ থেকে পূর্ণ, সীমা থেকে অসীম সৌন্দর্যালোকে, সার্বজনীন বোধে পরিব্যাপ্ত। সুগভীর দার্শনিক মনন নিয়েই নিজস্ব দর্শন চেতনাকে সুস্পষ্ট করে তুললেন ভিন্নমাত্রিক প্রতিবাদী ব্যঞ্জনায়। তাঁর প্রতিবাদী চেতনার সুর যেমন গল্পে, উপন্যাসে, তেমনি নাট্য সৃষ্টির মধ্যেও লক্ষণীয়। মূলত রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' রূপক-সাংকেতিক নাটকে তাঁর দার্শনিক মন ও মননের প্রতিফলনে প্রতিবাদী চেতনা কীভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে তাই এই প্রবন্ধে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

দার্শনিক আলোচনার যে সমস্ত পদ্ধতি প্রথাগতভাবে আলোচিত সেখানে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি (Dialectical method) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কান্টের মতে, অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে যে বুদ্ধি বিভ্রান্তি ও পরস্পর বিরোধিতার উদ্ভব হয়, তার মূল কারণ অন্বেষণ করার নামই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। আবার হেগেলের মতে, পরস্পর বিরোধী ধারণাগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া তাই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার উপজীব্য বিষয়। হেগেলের দর্শনে চৈতন্য হল পরম পদার্থ (absolute consciquence) তিনি বলেন, অভিব্যক্তির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিরোধকে (Contradiction) সমন্বয়ের (synthesis) বন্ধনে রূপায়িত করা। বিরোধের মধ্য দিয়ে সমন্বয় ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি একেই হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া (dialectical process) নামে অভিহিত করেছেন। বাদ (thesis), প্রতিবাদ (antithesis) ও সমন্বয় (synthesis) এই নিয়েই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ত্রয়ী রচিত হয়েছে।

দ্বন্দ্বে মিলন ও বিরোধ উভয়েরই ব্যঞ্জনা স্বীকার্য। তাই বিরোধী মতবাদের মধ্যে পূর্ণতর সত্যের অনুসন্ধানই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেশিরভাগ নাটকে সেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। এবং তাঁর প্রায় প্রতিটি নাটকে চরিত্রের চিন্তা চেতনায় প্রতিবাদী সত্তাকে যথেষ্ট মূল্য প্রদান করেছেন। আর সেই প্রতিবাদী চেতনার আলোকে নাটকে চরিত্রের বাদ-প্রতিবাদ এবং পরিশেষে সমন্বয় সূত্রে পূর্ণতর সত্যের অনুসন্ধান করেছেন।

লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ নাটকের মূল/কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্যে নিজস্ব প্রতিবাদী চেতনাকে সুগভীর জীবনাদর্শের আলোকে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু অন্যান্য চরিত্রগুলিকেও কোন একটি নির্দিষ্ট দর্শনবোধের প্রেক্ষাপটে রূপায়িত করেছেন। 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় কিংবা অভিজিৎ, 'রক্তকরবী'র নন্দিনী, 'অচলায়তনে'র পঞ্চক, 'বিসর্জনে'র জয়সিংহ, 'ডাকঘরে'র অমল, 'রাজা'র রাজা ইত্যাদি চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব দর্শনকে প্রকট করে তুললেন। কখনো বাস্তবতার আলোকে, কখনো মানবিক মূল্যবোধের নিরিখে, কখনো রোমান্টিকতার আবেশে, কখনোবা ব্যক্তিত্ববোধের সুপ্রতিষ্ঠিত রুপায়ণে। মানবজীবনের চরম ও পরম তথা পূর্ণতর সত্য সন্ধানেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী চেতনাকে অভিনব শিল্পকৌশলে ফুটিয়ে তুললেন। তাঁর 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

মানব জীবনের অব্যাহত, স্বচ্ছন্দ, অবিরাম সচল গতিই মুক্তধারা। গতির স্রোতে মানুষ ক্রমাগত ভেসে চলেছে। জন্ম জন্মান্তরের নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে সে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। এই গতিই, চলমানতাই জীবনের স্বরূপ। এই গতির মধ্যেই মানব জীবনের সার্থকতা। কিন্তু সেই গতিময়তা ও চলমানতাকেই রুদ্ধ করছে ও করায়ত্ত করেছে রাজা রণজিৎ। যন্ত্ররাজ বিভূতির দ্বারা এক বিরাট লৌহ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে। রাজার আদেশে রাজ ইঞ্জিনিয়ার বিভূতি বিদ্রোহী, প্রতিবাদী, পীড়িত প্রজাদের দমনের জন্য এটি নির্মাণ করেছেন। মানুষের

সচল জীবনধারার বাধা সৃষ্টি করেছে রাজশক্তির সহায়তায়। পাশ্চাত্যের উগ্র, সংকীর্ণ জাতীয়তা ও রাষ্ট্রনীতির এটিই অন্তর্নিহিত স্বরূপ।

যন্ত্রবাদ দর্শনে প্রাণের তত্ত্বকে স্বীকার করা হয় না। যন্ত্ররাজ বিভূতি যন্ত্রবাদী দর্শনে বিশ্বাসী। তাই তার প্রতিবাদ প্রাণ শক্তির বিরুদ্ধে। যন্ত্রশক্তির মহিমায় সে উদ্বুদ্ধ, আপ্লুত-

"দুত: এতকাল ধরে তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝরনাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বার বার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবালিতে চাপা পড়লো, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে-

বিভুতি: তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দুত: শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনো এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যেজল দিয়েছেন কোন মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভুতি: দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।

... ...

দুত: ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙতে পারবে না?

বিভুতি: না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।"[১]

এই যন্ত্র সর্বস্বতায় মানুষের অন্তরাত্মা, তার মনুষ্যত্ব পীড়িত। কুমার অভিজিৎ মানুষের সেই নিপীড়িত অন্তরাত্মা নিপীড়িত হচ্ছে পরাধীন, শোষিত জাতির মধ্যে। সমগ্র বিজিত পরাধীন জাতির অন্তরাত্মার প্রতীক ধনঞ্জয় বৈরাগী। উভয়েই একই অচলবস্থার, রুদ্ধতার প্রতিবাদী। যার মূল অবলম্বন মানবতা। একজনের প্রতিবাদ বুদ্ধি ও বিজ্ঞানদৃপ্ত মূল যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে, আর একজনের প্রতিবাদ যান্ত্রিক ব্যবস্থা বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে। উভয়ের বিরুদ্ধতাই যন্ত্রের বিরুদ্ধে ও মানুষের মুক্তির সপক্ষে। যে প্রতিবাদী চেতনা রবীন্দ্রনাথের গঠনগত পূর্ণতর সত্য সন্ধানে নিহিত।

'মুক্তধারা'র বাঁধই যান্ত্রিকতার চরম রূপ। যন্ত্রের প্রবল শক্তি সেখানে কেন্দ্রীভূত। এই বাঁধ ভাঙা সহজসাধ্য নয়। তাই অভিজিৎ যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তার প্রাণ বিসর্জন যেন যন্ত্রের কাছে প্রাণের প্রতিবাদ-

> "আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে যখন ওরা লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে, তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্য।"[২]

এই প্রতিবাদ পীড়নকারীর অন্তরাত্মারই প্রতিবাদ। অভিজিৎ জগত ও জীবনকে গভীরভাবে ভালোবাসে বলেই যন্ত্রের হাতে মনুষ্যত্বের অপমান সহ্য করতে পারে না। যে যন্ত্র ধরণীর সৌন্দর্য ও জীবনের মাধুর্য বিনষ্ট করেছে, বিধাতার দান এই অপূর্ব সুন্দর জীবনকে হরণ করেছে, তিক্ত ও বিষাক্ত করেছে তার প্রতিবাদ সেই যন্ত্রের বিরুদ্ধে, আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে- 'স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করি নে'। 'স্বর্গ' শব্দের তাৎপর্য মানবতা এবং 'দৈত্য' শব্দে নিষ্ঠুরতার আভাসই প্রতিকায়িত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনের এক অন্যতম লক্ষণই হল অহিংস উপায়ে গঠনগত, পূর্ণতর সত্যের সন্ধান। সেই সত্যান্বেষী ভাবনা ধনঞ্জয়ের মাধ্যমে প্রতীকী উপায়ে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর প্রতিবাদী চেতনায় মনুষ্যত্ববোধের, উচ্চ-ন্যায়াদর্শের ভাব প্রতিফলিত।

'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী বিজিত অত্যাচারিত জাতির আত্মিক প্রতীক। আত্মার শক্তি জড়শক্তি বা যন্ত্রের শক্তি নয়, সে শক্তি বৃহত্তর নীতির শক্তি। তাই ন্যায় ও নৈতিকতার দোহাই দিয়ে যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জানিয়েছে-

"রণজিৎ: খাজনা দেবে কিনা, বল।
ধনঞ্জয়: না, মহারাজ দেব না।
রণজিৎ: দেবে না! এতবড় আস্পর্ধা?
ধনঞ্জয়: যা তোমার নয়, তা তোমাকে দিতে পারব না?
রণজিৎ: আমার নয়?
ধনঞ্জয়: আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।
... ...
ধনঞ্জয়: ..... রাজা, ভুল করছ এই যে, ভাবছ জগতৎটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার হল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, ক্ষুধার মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে। ..."[৪]

এই সমস্ত প্রতিবাদী উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতের ছায়াপাত রয়েছে। 'রাজত্ব যে কেবল রাজার নয়, প্রজারাও' এই প্রতিবাদী চেতনা তাঁর বহু প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। কালিদাস নাগকে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানান-

> "তোমার চিঠিতে machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ, সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়।"[৫]

নাটকে বাদ, প্রতিবাদ ও শেষে সমন্বয়ের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অভিজিৎ- এর একটি প্রাণের বিনিময়ে শত শত প্রাণ জেগে উঠেছে। বেঁচে থাকার উপাদান চিরদিনের মতো দান করেছে অভিজিৎ। প্রাণ প্রবাহে শিবতরাইয়ের পীড়িত মানুষ ফিরে পেয়েছে তাদের সজীবতা, সচলতা। হেগেলীয় দর্শনের সেই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকেই যেন অভিনব শিল্পকৌশলে বিমূর্ত করে তুললেন রবীন্দ্রনাথ।

দর্শনে জড়বাদ বা বস্তুবাদ (materialism) বলতে দেহের সম্ভোগ বা সুখকর সংবেদনকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটকের পটভূমি জড়বাদ বা বস্তুবাদ। বলা যায়, পশ্চিমী বস্তুসর্বস্ব জড়বাদ, যান্ত্রিক শাসন ও সভ্যতা এবং লুব্ধ ধনতন্ত্রবাদ 'রক্তকরবী'র আবহ। তিনি এই বস্তুসর্বস্ব জড়বাদের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদী চেতনা ব্যক্ত করলেন। বাদ-প্রতিবাদ প্রাণবাদকেই সমন্বয়ের আদর্শে ফুটিয়ে তুললেন রবীন্দ্রনাথ।

নাটকের অন্যতম মূল চরিত্র রাজা ধনতন্ত্রের বস্তুসর্বস্বতায় আকীর্ণ। যক্ষপুরী বিশেষভাবে স্বর্ণ উত্তোলনের একটা কারখানা। ঐশ্বর্য সংগ্রহের এক মহাকেন্দ্র, কুবেরের অবস্থান। এখানে ঐশ্বর্যর রূপটাই অধিক প্রকটিত। যক্ষপুরীর পরিকল্পনায় পাশ্চাত্য সভ্যতার (আমেরিকা) ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জানান-

> "অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকার ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। ..... এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে তার ক্রোধ চেপে যায়, গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরির মতো সে ভোঁ হয়ে যায়। ... আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই, - এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না।"[৬]

'রক্তকরবী'র মর্মকথা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানান-

> "নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। এই ভাবটা আমার 'রক্তকরবী'র নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।"[৭]

নাটকটির মূল দ্বন্দ্ব রাজা ও নন্দিনীর মধ্যে। রাজা জটিল জালে বাস করেন। বস্তুতন্ত্রের নিরেত সাধনা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা অপর্যাপ্ত শক্তিলোপ ও প্রভূত ঐশ্বর্য সম্ভোগ করেন। মনুষ্যত্বহীন, হৃদয়হীন, সঞ্চয়কামী, শোষণশীল সমাজ ও যান্ত্রিক ব্যবস্থায় অতিবাহিত করেন শূন্যতার জীবন। আসলে 'অচলায়তনে'র প্রাচীর, 'মুক্তধারা'র বাঁধ ও 'রক্তকরবী'র জাল মূলত একই মুদ্রার সমরূপ। রবীন্দ্রনাথ নন্দিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেই জড়ত্ব, শূন্যতা তথা আনন্দহীন জীবনেরই প্রতিবাদ ধ্বনিত করলেন সু-উজ্জ্বল কণ্ঠে।

নন্দিনীর কাজ তার সাধনা মূলত প্রাণের, সজীবত্বের। সে রাজার জালের মধ্যে ঢুকে তাকে জালের মধ্যে ঢুকে তাকে জালের আড়াল থেকে বের করে আনতে চায়। জালের দরজায় ঘা দিয়ে আনন্দ চিত্তে বলে ওঠে-

> "আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই। ... জাল খুলে দাও, ভিতরে যাব।"[৮]

অন্যদিকে রাজা জানান-

> "না, ঘরের মধ্যে নয়, আসতে দেব না, কী বলবে শীঘ্র বলো। আমার সময় নেই, একটুও না।"[৯]

মকররাজ এতদিন আনন্দের মতো জড়বস্তু, নিষ্প্রাণ, বিজ্ঞানশক্তির মোহে আচ্ছন্ন হয়েছে। তাই নন্দিনী প্রাণধারার বাণী নিয়ে রাজার সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদে সরব হয়েছে। অভিব্যক্তি ঘটেছে তাঁর আলোক চৈতন্যের-

> "নন্দিনী: (জানালায় ঘা দিয়ে) সময় হয়েছে, দরজা খোলো।
> নেপথ্যে: আবার এসেছ অসময়ে। এখনি যাও, যাও তুমি..... আজ ধ্বজাপূজা, আমায় বিরক্ত করো না। পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও এখনি যাও।
> নন্দিনী: আমার ভয় ঘুচে গেছে। এমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।
> নেপথ্যে: আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ... এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে। ...
> নন্দিনী: বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।"[১০]

প্রাণ প্রতিষ্ঠার এই অভিনব প্রতিবাদ, বাংলা নাট্য সাহিত্যে দুর্লভ। জড়ত্বের অবসানেই সজীবত্বের প্রতিষ্ঠা। নন্দিনীর প্রতিবাদ সেই জড়শক্তিরই বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ সমন্বয়ের সুললিত বাণী শোনালেন নন্দিনীর প্রাণময়তার কণ্ঠস্বরে। বিশুর মুক্তিকামী চিন্তা-চেতনা যেন সমস্ত অবরুদ্ধ স্বরের স্ফুটন। সে বলে ওঠে- 'এতদিন পরে আমার মুক্তি হল... সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি– এ বন্ধন তারই সত্যের সাক্ষী হয়ে রইলো।'

লক্ষণীয়, বস্তু সম্পর্কে হিউম জড়াত্মক দ্রব্য সম্পর্কিত বিশ্বাসকে সংস্কারগ্রস্ত বলে অভিহিত করেছেন। মুখ্য ও গৌণ উভয়প্রকার গুণই বুদ্ধিগত না হলেও তাদের অস্তিত্ব সন্দেহজনক। আর 'আত্ম সম্পর্কে তিনি জানান- আত্মাকে ধরিবার বা সাক্ষাৎভাবেপাইবার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, বিশেষ (particular) সংবেদন (sensation) আবেগ (feeling) ইচ্ছা (will) ছাড়া তার কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় না'। সুতরাং তাঁর মতে, আত্মা বা মন বলে কোন দ্রব্যের (substance) কল্পনা মোটেই যুক্তিসম্মত নয়।

আবার বস্তু সম্পর্কে কান্টের মতবাদ স্বীকার্য। তিনি আত্মগত ভাববাদের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, দেশ-কালকে অভিজ্ঞতার ব্যাপারে ব্যবহারিকভাবে (empirically) বাস্তব তত্ত্ব বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। জ্ঞানতত্ত্ব মতবাদের উপর ভিত্তি করে অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুর গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ আসলে 'রক্তকরবী' নাটকে মকররাজকে বস্তুবাদী বা জড়বাদী তত্ত্ব রূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আর তাই রাজা ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বস্তুসর্বস্বতায় বারবার নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে চান। তিনি জানান- 'দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মাণিক আনি, সহজের থেকে ঐ প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে'। 'আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না'। নন্দিনী তাঁর সহজাত মানবিক মূল্যবোধের নিরিখেই সজীব প্রাণের সত্তায় নিজস্ব প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছে- 'তোমার এত আছে, তবু কেবলই অমন লোভীর মতো কথা বলো কেন'?

জড়বাদ ও প্রাণবাদের যে বিরোধ, হেগেলের মতে, তার মধ্যেই নিহিত থাকে সমন্বয়ের সুর। তিনি বলেন, ব্যবহারিক (empirical) ও পারমার্থিক (noumenal) বিষয়ের মধ্যে বিরোধ সত্ত্বেও এক সমন্বয় রয়েছে। বিরোধ ও সমন্বয় উভয়ই পরম চৈতন্যের (absolute consciousness) স্বরূপ। হেগেলীয় দর্শনে মূর্ত বস্তুর কথাই বলা হয়েছে। শুদ্ধ চৈতন্য শুদ্ধ জড়ের বিরোধী। এই বিরোধিতা পরম পদার্থের অভিব্যক্তির জন্য একান্ত অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ সেই অপরিহার্যতাকেই প্রতিবাদী চেতনায়, দার্শনিক মন ও মননে, শুদ্ধ চৈতন্যের আলোকে অভিনব শিল্পরূপ দান করলেন।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মুক্তধারা। বিশ্বভারতী প্রকাশনী, শান্তিনিকেতন, ১৩৮৬ সাল, পৃ. ৩।
২। তদেব, পৃ. ১৩।
৩। তদেব, পৃ. ১৩।
৪। তদেব, পৃ. ২৪।
৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী। ১৪শ খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, শান্তিনিকেতন, ১৩৮০ সাল, পৃ. ৫৩২-৩৩।
৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষার মিলন, কালান্তর। বিশ্বভারতী প্রকাশনী, শান্তিনিকেতন, ১৩২৮ সাল, ভাদ্র, পৃ. ১৭১-৭২।
৭। যাত্রী, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী, ২৮ শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪, পৃ. ১১৯।
৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রক্তকরবী। বিশ্বভারতী প্রকাশনী, শান্তিনিকেতন, ১৩৮০ সাল, পৃ. ১০০।
৯। তদেব, পৃ. ১০০।
১০। তদেব, পৃ. ১০৩।